



Applied for e-ISSN vide application no. 76157, Dated 22/08/2026, UDYAM-WB-011-0097957

প্রথম বর্ষ, চতুর্থ মাস, ষষ্ঠ সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, আশ্বিন ১৯, ইংরেজি ২০২৬, অক্টোবর ৭



ষোলহাজার ফুটে সফল পরীক্ষা ডিআরডিওর

নয়াদিল্লি: উচ্চ-উচ্চতা অঞ্চলে ভারতের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে একদিনে জোড়া সাফল্য পেল প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা বা ডিআরডিও। লাদাখের নিয়োমা এলাকায় ১৬ হাজার ফুট উচ্চতা থেকে দেশীয়ভাবে তৈরি অ্যাডভান্সড হাই-অল্টিটিউড প্যারাসুট বা এইচএপি-র প্রথম লাইভ জাম্প সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। একই সঙ্গে ডিআরডিও দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি হাই-অল্টিটিউড প্ল্যাটফর্ম বা এইচএপিএস-এর সফল উড্ডয়ন পরীক্ষাও চালিয়েছে, যা ২১ কিলোমিটার উচ্চতায় পৌঁছে ২০ কিলোমিটার উচ্চতায় ৩০ মিনিটেরও বেশি সময় অবস্থান করে। নিয়োমার মুখ ভ্রূপ জোনে এইচএপি-র প্রথম লাইভ জাম্পটি পরিচালিত হয় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৬ হাজার ফুট উচ্চতা থেকে। ১৫,৫০০ ফুট উচ্চতায় প্যারাসুটটি সক্রিয় করা হয় এবং ১৩,৭০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত নিয়োমা মুখ ভ্রূপ জোনে অবতরণ সম্পন্ন হয়। পরীক্ষাটি অত্যন্ত উচ্চ-উচ্চতার ভূখণ্ডে এইচএপি ব্যবস্থার কার্যকারিতা এবং কৌশলগত ব্যবহারের সক্ষমতা যাচাই করেছে।

আগের অ্যারিয়াল ডেলিভারি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এস্টাবলিশমেন্ট বা এডিআরডিই এইচএপি-র নকশা ও উন্নয়ন করেছে। এটি একটি স্ট্যাটিক-লাইন প্যারাসুট ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে একসঙ্গে বহু প্যারাট্রুপারকে নামানো সম্ভব। প্যারাসুটটির

বিভিন্ন ধরনের ডিপ্লয়মেন্ট বা মোতায়েনের ব্যবস্থা রয়েছে এবং সর্বোচ্চ ১৮ হাজার ফুট পর্যন্ত বিস্তৃত অপারেশনাল উচ্চতায় এটি ব্যবহার করা যায়। বিশেষ করে উচ্চ-উচ্চতা অঞ্চলে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর কৌশলগত প্রয়োজন মেটানোর জন্য নিরাপদ অবতরণ হারকে গুরুত্ব দিয়ে ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে। উচ্চতায় স্ট্যাটিক-লাইন প্যারাসুট জাম্প অত্যন্ত জটিল এবং ঝুঁকিপূর্ণ। এই ধরনের উচ্চতায় প্যারাসুট খোলার সময় প্রবল ওপেনিং শক এবং অবতরণের উচ্চ হার বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। সেই পরিস্থিতিতে নিয়োমায় এইচএপি-র সফল পরীক্ষাকে উচ্চ-উচ্চতা এলাকায় দেশীয় এয়ারবর্ন অপারেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এইচএপি তৈরি করেছে অর্ডন্যান্স প্যারাসুট ফ্যাক্টরি, কানপুর। সিস্টেমটি ডিরেক্টরেট জেনারেল অ্যারোনটিক্যাল কোয়ালিটি অ্যাসিওরেশন বা ডিজিএকিউএ পরিদর্শন করেছে এবং কানপুরের সিইএমআইএলএসি, আরসিএমএ-র মাধ্যমে শংসাপ্রাপ্ত হয়েছে। অন্যদিকে, ডিআরডিও-র দ্বিতীয় পরীক্ষাটি উচ্চ-উচ্চতার দীর্ঘক্ষণ উড্ডয়ন সক্ষমতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। দেশীয়ভাবে তৈরি হাই-অল্টিটিউড প্ল্যাটফর্মটি পরীক্ষামূলক উড্ডয়নে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২১ কিলোমিটার উচ্চতায় পৌঁছয়। এরপর ২০ কিলোমিটার উচ্চতায় ৩০ মিনিটেরও

দ্বিতীয় পাতায়

ক্যাবিনেটে বড় সিদ্ধান্ত

নয়াদিল্লি: ছোট ও মাঝারি শিল্পের বৃদ্ধিতে দীর্ঘমেয়াদি মূলধনের জোগান বাড়ানো এবং দেশের পরিবহণ ও লজিস্টিক্স পরিকাঠামোর পরিকল্পনাকে এক ছাতার তলায় আনার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ দু'টি সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। একদিকে ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় ছোট ও মাঝারি সংস্থাগুলিতে সরাসরি ইকুইটি বিনিয়োগের জন্য ১০ হাজার কোটি টাকার এসএমই গ্রোথ ফান্ড গঠনে সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুমোদিত হয়েছে। অন্যদিকে সড়ক, রেল, বন্দর, বিমান পরিবহণ, অভ্যন্তরীণ জলপথ, উপকূলীয় পরিবহণ এবং নগর পরিবহণকে সমন্বিত করে পরিকল্পনা ও নজরদারির জন্য ইন্টিগ্রেটেড ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড লজিস্টিক্স অথরিটি বা আইটিএলএ গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এসএমই গ্রোথ ফান্ডের লক্ষ্য হল এমন ছোট ও মাঝারি সংস্থাকে দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি-ভিত্তিক মূলধন দেওয়া, যাদের ব্যবসায়িক মডেল ইতিমধ্যেই কার্যকর এবং দ্রুত সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন তহবিলের মাধ্যমে ইকুইটি সহায়তা দেওয়া হলেও তার বড় অংশ প্রাথমিক পর্যায়ের সংস্থা এবং মাইক্রো উদ্যোগকে কেন্দ্র করে। ফলে বেসসা সম্প্রসারণের পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া ছোট ও মাঝারি সংস্থার জন্য প্রয়োজনীয় গ্রোথ ক্যাপিটালের ক্ষেত্রে একটি কাঠামোগত ঘাটতি রয়েছে। নতুন তহবিল সেই ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যেই তৈরি হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার এসএমই গ্রোথ ফান্ডের

অধীনে গঠিত অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড বা এআইএফ-এ মোট ১০ হাজার কোটি টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেবে। তহবিলের বড় অংশ ছোট ও মাঝারি উৎপাদনমুখী সংস্থায় বরাদ্দ করা হবে। পাশাপাশি টিয়ার-২ এবং টিয়ার-৩ শহরের শিল্প ক্লাস্টারে কাজ করা এসএমইগুলিও এই তহবিলের আওতায় আসতে পারবে।

দীর্ঘমেয়াদি মূলধনের মাধ্যমে সংস্থাগুলিকে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো, উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণ, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ, বৈশ্বিক ভ্যালু চেইনে যুক্ত হওয়া এবং কৌশলগত বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করা হবে। সরকারের প্রত্যাশা, এর ফলে এমন একদল ভারতীয় সংস্থা তৈরি হবে, যারা নিজেদের ক্ষেত্রে বৃহৎ আকারে প্রতিযোগিতা করতে পারবে এবং আন্তর্জাতিক বাজারেও ভারতীয় শিল্পের প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হবে।

বিশেষ করে উৎপাদন ক্ষেত্রে এই তহবিলের প্রভাবকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তি গ্রহণ এবং বৃহত্তর পরিসরে উৎপাদনের মাধ্যমে সংস্থাগুলির উৎপাদনশীলতা ও রপ্তানি প্রতিযোগিতা বাড়ানোর পাশাপাশি টিয়ার-২ ও টিয়ার-৩ শহরের শিল্প ক্লাস্টারে বিনিয়োগ আঞ্চলিক শিল্পোন্নয়ন এবং স্থানীয় সরবরাহ-শৃঙ্খলকে শক্তিশালী করবে। এর ফলে উচ্চমানের কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হওয়ার প্রত্যাশা করছে সরকার। এই উদ্যোগকে কেন্দ্রের বৃহত্তর এসএমই নীতির অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে। ঋণ

সহায়তা, ডিজিটালাইজেশন, ব্যবসা পরিচালনার সহজীকরণ, সরকারি ক্রয় ব্যবস্থার সংস্কার, স্টার্ট-আপ সহায়তা এবং উৎপাদন-ভিত্তিক উৎসাহ প্রকল্পের পাশাপাশি এবার বৃদ্ধির পর্যায়ে থাকা ছোট ও মাঝারি সংস্থার জন্য সরাসরি দীর্ঘমেয়াদি ইকুইটি মূলধনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অন্যদিকে, পরিবহণ ও লজিস্টিক্স ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা মোকাবিলায় আইটিএলএ গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা। বর্তমানে পরিবহণ-সম্পর্কিত বিভিন্ন মন্ত্রক ও সংস্থার মধ্যে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। নতুন বিশেষ উদ্দেশ্য সংস্থা বা এসপিভি এই বিচ্ছিন্নতা কমিয়ে বহুমুখী পরিবহণ ব্যবস্থাকে একসঙ্গে পরিকল্পনা ও পরিচালনার কাঠামো তৈরি করবে। আইটিএলএকে জাতীয় স্তরের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হবে। সড়ক, রেল, বন্দর ও জাহাজ পরিবহণ, অসামরিক বিমান পরিবহণ, অভ্যন্তরীণ জলপথ, উপকূলীয় পরিবহণ, নগর গতিশীলতা এবং লজিস্টিক্স—সব ক্ষেত্রকে নিয়ে অন্তত ১০ বছরের সময়সীমায় একটি জাতীয় পরিবহণ মাস্টার প্ল্যান তৈরি করবে এই সংস্থা। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকগুলির প্রায় পাঁচ বছরের খাতভিত্তিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক পরিকল্পনাকেও এই দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না, তা পর্যালোচনা করা হবে। ৫০০ কোটি টাকা বা

দ্বিতীয় পাতায়

প্রতিরক্ষায় দেশীয় সক্ষমতা

হ্যালের ২ হাজারতম এয়ারো ইঞ্জিন, ব্রহ্মাসে ৬৬১ কোটি চুক্তি

নয়াদিল্লি: প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দেশীয় প্রযুক্তি ও উৎপাদন সক্ষমতা আরও শক্তিশালী করার পথে একদিনে গুরুত্বপূর্ণ দু'টি পদক্ষেপ নিল ভারত। ওড়িশার কোরাপুটে হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড বা হ্যালের ২,০০০তম এয়ারো-ইঞ্জিন সরবরাহের মাইলফলক অর্জিত হয়েছে। একই দিনে ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজের জন্য ব্রহ্মাস ফায়ার কন্ট্রোল সিস্টেম ও লঞ্চার সংগ্রহে ৬৬১.৫০ কোটি টাকার চুক্তি করেছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। দুটি উদ্যোগেই দেশীয় নকশা, উৎপাদন, প্রযুক্তি এবং সরবরাহ-শৃঙ্খলকে প্রতিরক্ষা সক্ষমতার কেন্দ্রে রাখার বার্তা স্পষ্ট হয়েছে।

প্রাক্তপক্ষে, ভারত চাইছে, স্বাধীনতার শতবর্ষ পূর্তির আগেই নিজের ডিফেন্স প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব অর্জন করতে ইতিমধ্যেই একাধিক পদক্ষেপের মাধ্যমে দেশের ডিফেন্স ব্যবস্থাকে আরও স্বনির্ভর করার দিকে এগিয়েছে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের সরকার। একদিকে যেমন প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে, তেমনই অন্যদিকে, কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে যেন কোনও বাধার সম্মুখীন হতে না হয়, তাও নিশ্চিত করতে চাইছে। এই পরিস্থিতিতে, এই দুই উদ্যোগ, দেশের ডিফেন্স ব্যবস্থাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে বলেই মনে করছেন যুদ্ধ বিশেষজ্ঞরা।

কোরাপুটে ২,০০০তম এয়ারো-ইঞ্জিন সরবরাহের অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, এয়ারো-ইঞ্জিনকে বিমানের ‘হৃদয়’ বলা যায়। উন্নত এয়ারফ্রেম, রাডার, অস্ত্র এবং অ্যাভিওনিক্সের পূর্ণ সক্ষমতা কাজে লাগাতে নির্ভরযোগ্য প্রপালশন প্রযুক্তি অপরিহার্য। তাঁর বক্তব্যে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে উন্নত এয়ারো-ইঞ্জিনের নকশা, উন্নয়ন, পরীক্ষা, উৎপাদন এবং রক্ষণাবেক্ষণে দেশীয় সক্ষমতা তৈরি করা। ১৯৬৪ সালে কোরাপুট ডিভিশন প্রতিষ্ঠার পর প্রায় ছয় দশকে এই প্রতিষ্ঠান সামরিক বিমান চলাচলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ইঞ্জিন উৎপাদন ও রক্ষণাবেক্ষণ করেছে। মিগ-

২১, মিগ-২৭, মিগ-২৯ এবং সুখোই-৩০এমকেআই-এর মতো যুদ্ধবিমানে হ্যাল কোরাপুটের ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয়েছে। পাশাপাশি এখনও পর্যন্ত ৯,০০০-এরও বেশি ইঞ্জিন ওভারহল বা পুনর্নবীকরণের কাজ সম্পন্ন করেছে সংস্থাটি। প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে নতুন ইঞ্জিন উৎপাদনের পাশাপাশি পুরনো ইঞ্জিনের অ্যায়ু বাড়ানোর এই ক্ষমতাকেও গুরুত্বপূর্ণ বলে তুলে ধরা হয়েছে।

এয়ারো-ইঞ্জিন প্রযুক্তির জটিলতার কারণে দেশীয় সক্ষমতা তৈরির বিষয়টিও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত। উন্নত সুপারঅ্যালয়, তাপ-প্রতিরোধী আবরণ, অত্যাধুনিক কুলিং ব্যবস্থা, ধাতুবিদ্যা, নিখুঁত উৎপাদন প্রযুক্তি এবং কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ—সবকিছুর সমন্বয় প্রয়োজন এই প্রযুক্তিতে। সেই কারণেই প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, আত্মনির্ভর বিমান ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কাঁচামাল থেকে শুরু করে নকশা, উৎপাদন, পরীক্ষা এবং রক্ষণাবেক্ষণ পর্যন্ত একটি সার্বভৌম প্রযুক্তি-ভিত্তিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে।

উন্নত মাঝারি যুদ্ধবিমানF বা এএমসিএ কর্মসূচির জন্য দেশীয় উচ্চ-থ্রাস্ট ইঞ্জিন তৈরির ক্ষেত্রেও প্রায় ৫,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে। মিশ্র ধাতু নিগম লিমিটেড বা মিধানির সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কাঁচামালের দেশীয়করণ এবং দেশের প্রথম দেশীয় উচ্চ-থ্রাস্ট ইঞ্জিন পরীক্ষাকেন্দ্র তৈরির উদ্যোগও এই বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ।

এদিকে হ্যালের এএল-৩১এফপি ইঞ্জিন উৎপাদনের বার্ষিক ক্ষমতা ৩০টি থেকে বাড়িয়ে ৫০টি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর জন্য ৩৩৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। ২০২৪ সালে সুখোই-৩০এমকেআই-এর জন্য হ্যালকে ২৪০টি এএল-৩১এফপি ইঞ্জিনের বরাদ্দ দিয়েছিল সরকার। আন্তর্জাতিক সরবরাহ-শৃঙ্খলের সমস্যা এবং কাঁচামালের চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ের আগে প্রথম ইঞ্জিন সরবরাহ করা হয়। দ্বিতীয় বছরের শেষে ৬০টির লক্ষ্যমাত্রার জায়গায়

৬৩টি ইঞ্জিন সরবরাহ করেছে হ্যাল। একই সঙ্গে শক্তি ইঞ্জিনের জন্য দ্বিতীয় উৎপাদন লাইন তৈরিতে ২১৮ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। এই লাইন চালু হলে বছরে সর্বোচ্চ ১০০টি ইঞ্জিন উৎপাদনের ক্ষমতা তৈরি হবে এবং ২০২৮-২৯ সালের মধ্যে সেটি সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা।

ধ্রুব অ্যাডভান্সড লাইট হেলিকপ্টার এবং প্রচণ্ড লাইট কমব্যাট হেলিকপ্টারের মতো দেশীয় হেলিকপ্টারের প্রয়োজন মেটাতে এই উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহার করা হবে।

প্রতিরক্ষা শিল্পের এই বৃহত্তর দেশীয়করণ প্রক্রিয়ায় এমএসএমই, স্টার্ট-আপ, বেসরকারি শিল্প, বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে আরও বেশি করে যুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন রাজনাথ সিং। তাঁর বক্তব্য, কোরাপুটকে কেবল ইঞ্জিন উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে না রেখে বৃহত্তর এয়ারোস্পেস প্রপালশন ইকোসিস্টেমের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা প্রয়োজন।

এর পাশাপাশি একই দিনে নয়াদিল্লিতে ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য ব্রহ্মাস ফায়ার কন্ট্রোল সিস্টেম ও লঞ্চার সংগ্রহে ব্রহ্মাস অ্যারোস্পেস প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে ৬৬১.৫০ কোটি টাকার চুক্তি করেছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। ‘বাই ইন্ডিয়ান-আইডিডিএম’ শ্রেণিতে সম্পন্ন এই চুক্তিতে ন্যূনতম ৬৮ শতাংশ দেশীয় উপাদান থাকবে। প্রকল্পটির মাধ্যমে বিভিন্ন ভারতীয় শিল্প সংস্থা, বিশেষ করে এমএসএমই-গুলির অংশগ্রহণ বাড়বে এবং তিন বছরের মধ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

ভারতীয় নৌবাহিনীর বিভিন্ন ফ্রন্টলাইন যুদ্ধজাহাজে ব্যবহৃত ব্রহ্মাস ব্যবস্থা নৌবাহিনীর প্রধান সারফেস-টু-সারফেস মিসাইল বা এসএসএম ব্যবস্থা। এটি সুপারসনিক গতিতে দীর্ঘ পাল্লা থেকে স্থল ও সমুদ্র—দুই ধরনের লক্ষ্যবস্তুতে নির্ভুল আঘাত হানতে সক্ষম। ফলে ফায়ার কন্ট্রোল ব্যবস্থা ও লঞ্চার সংগ্রহের এই চুক্তি নৌবাহিনীর সামুদ্রিক আঘাত হানার সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশীয় প্রতিরক্ষা উৎপাদন ব্যবস্থাকেও আরও শক্তিশালী করবে।

নোবেল বরফের গভীরে মহাবিশ্বের বার্তায়

শিবাজী লাহিড়ী

মালদা: মহাবিশ্বকে আমরা কীভাবে দেখব? এই প্রশ্নের উত্তর বদলেছে সময়ের সঙ্গে। একসময় মনে করা হত, মহাবিশ্বকে জানার প্রধান পথ আলো। তারপর সেই আলোর পরিধি বাড়ল—দৃশ্যমান আলোর বাইরে রেডিও তরঙ্গ, মাইক্রোওয়েভ, ইনফ্রারেড, অতিবেগুনি, এক্স-রে, গামা রশ্মি খুলে দিল মহাবিশ্বের একের পর এক নতুন জানালা। কিন্তু এই যাত্রার আরও পিছনে তাকালে দেখা যায়, তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গকে মানুষের নিয়ন্ত্রণে আনার পরীক্ষাগারে এক ভারতীয় বিজ্ঞানীর কাজও এক বিশেষ জায়গা দখল করে আছে। তিনি জগদীশচন্দ্র বসু।

নিজের হাতে তৈরি যন্ত্রপাতি নিয়ে বসু তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের ধর্ম নিয়ে এমন সব পরীক্ষা করেছিলেন, যা তাঁর সময়ের বৈজ্ঞানিক পরিসরে যথেষ্ট অগ্রগামী ছিল। তাঁর পরীক্ষায় দূর থেকে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজানো, এমনকি অন্য ঘরে রাখা বন্দুকের ট্রিগার সক্রিয় করার মতো প্রদর্শনও ছিল। তাঁর কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল—তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গকে শুধু তাত্ত্বিক ধারণা হিসেবে না দেখে তাকে পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ও শনাক্ত করার চেষ্টা। রেডিও তরঙ্গের ব্যবহারিক যোগাযোগব্যবস্থার বিকাশে পরে গুগলিয়েলমো মারকনির নাম বিশ্বজুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। বসুর কাজের স্বীকৃতি এবং মারকনির সঙ্গে তাঁর কাজের সম্পর্ক নিয়ে ইতিহাসে দীর্ঘ বিতর্কও রয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান-ইতিহাসের বৃহত্তর ছবিতে এই অধ্যায়টির তাৎপর্য অন্য জায়গায়—মানুষ বুঝতে শুরু করেছিল, চোখে দেখা আলোই মহাবিশ্বকে জানার একমাত্র মাধ্যম নয়। তারপর পদার্থবিদ্যা আরও এক বড় বাঁক নিল।

আলো কি তরঙ্গ, না কণা? প্রশ্নটি একসময় পদার্থবিদ্যার অন্যতম গভীর সমস্যায় পরিণত হল। শেষ পর্যন্ত জন্ম নিল কণা-তরঙ্গ দ্বৈত সত্ত্বার ধারণা। পদার্থের ক্ষুদ্রতম স্তর সম্পর্কে মানুষের ধারণা বদলে গেল। পরমাণুর ভিতরে ঢুকে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার

করলেন ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন; পরে এল অ্যান্টিপার্টিকল, কোয়ার্ক এবং কণাপদার্থবিদ্যার আরও অসংখ্য মৌলিক কণা। প্রতিটি আবিষ্কার মহাবিশ্বকে দেখার মানুষের জানালাকে আরও একটু প্রশস্ত করেছে। কিন্তু এখানেই গল্প শেষ হয়নি। কারণ মহাবিশ্বের সব বার্তা আলো বহন করে না। কিছু বার্তা আসে এমন কণার মাধ্যমে, যারা প্রায় কোনও কিছুর সঙ্গেই মিথস্ক্রিয়া করে না। তারা নক্ষত্র, গ্যাস, ধূলিকণা, এমনকি কোটি কোটি আলোকবর্ষের মহাজাগতিক পথ পেরিয়ে পৃথিবীতে পৌঁছতে পারে প্রায় নির্বিঘ্নে। সেই কণাই নিউট্রিনো। নিউট্রিনোকে ধরতে গেলে তাই প্রচলিত দূরবীক্ষণযন্ত্র যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন এমন একটি ‘টেলিস্কোপ’, যা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে না—বরং পৃথিবীর গভীরে অগোচর। আর সেই অসম্ভবকে সম্ভব করার অন্যতম স্থপতি হলেন ফ্রান্সিস হ্যালজেন।

দক্ষিণ মেরুর বরফের প্রায় দেড় কিলোমিটার গভীরে হাজার হাজার আলোক-সংবেদী যন্ত্র বসিয়ে তিনি এবং তাঁর সহযোগীরা তৈরি করেছেন আইসকিউব নিউট্রিনো অবজারভেটরি। সেখানে টেলিস্কোপের আয়না নেই, লেন্স নেই। আছে বরফ। সেই বরফের মধ্যে কোনও নিউট্রিনো বিরলভাবে অন্য কণার সঙ্গে সংঘর্ষ করলে যে ক্ষীণ আলোর ঝলক তৈরি হয়, সেই আলোই হয়ে ওঠে মহাবিশ্ব থেকে আসা বার্তার চিহ্ন। এ যেন জগদীশচন্দ্র বসুর সেই পুরনো প্রশ্নের বহু দূরের এক নতুন উত্তর—মহাবিশ্বকে জানতে হলে আমাদের ইন্দ্রিয়ের সীমার বাইরে গিয়ে তার পাঠানো সংকেত ধরতে হবে।

বসু যেখানে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গকে মানুষের পরীক্ষাগারে এনে দেখার চেষ্টা করেছিলেন, হ্যালজেন সেখানে প্রায় অদৃশ্য কণাকে ধরে মহাবিশ্বের গভীরতম ঘটনাগুলির দিকে তাকানোর নতুন পথ খুলেছেন। মাঝখানের এক শতাব্দীরও বেশি সময়ে পদার্থবিদ্যা বদলেছে, বদলেছে ‘দেখা’র সংজ্ঞাও। ২০২৬ সালের পদার্থবিদ্যায় *দ্বিতীয় পাতায়*



সম্পাদকীয়

প্রযুক্তি মানুষের কাজকে সহজ করার জন্য এসেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সেই সহজ করার প্রক্রিয়াকে এক নতুন মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। কয়েক সেকেন্ডে লেখা তৈরি হচ্ছে, জটিল হিসাবের সমাধান মিলছে, তথ্য খুঁজে বের করা যাচ্ছে, ছবি তৈরি হচ্ছে, কোড লেখা হচ্ছে, এমনকি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। কর্মক্ষেত্র থেকে শিক্ষাক্ষেত্র—প্রায় সর্বত্রই এআই এখন মানুষের সহকারী। কিন্তু প্রশ্নটা অন্য জায়গায়। সহকারী যখন ক্রমশ মানুষের হয়ে কাজ করতে শুরু করে, তখন মানুষ নিজে কতটা কাজ করতে শেখে? এআই-এর সবচেয়ে বড় সুবিধাই তার সবচেয়ে বড় বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে। কোনও বিষয় নিয়ে ভাবার আগেই যদি তার উত্তর পাওয়া যায়, কোনও লেখা নিজে তৈরি করার আগেই যদি সম্পূর্ণ লেখা সামনে চলে আসে, কোনও সমস্যার সমাধানে চেষ্টা করার আগেই যদি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সমাধান দিয়ে দেয়, তাহলে মানুষের নিজের চিন্তার অনুশীলন কমে যেতে বাধ্য। মস্তিষ্কও শরীরের পেশির মতো—ব্যবহার না করলে তার সক্ষমতা বাড়ে না। বরং দীর্ঘদিন অনৈয়ের উপর নির্ভরশীল থাকলে নিজে সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা, স্মৃতিশক্তি, বিশ্লেষণী দক্ষতা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার আত্মবিশ্বাস কমতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই বিপদের মাত্রা আরও বেশি। একজন ছাত্র যদি প্রতিটি উত্তর এআই দিয়ে লিখিয়ে নেয়, প্রতিটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান সরাসরি সংগ্রহ করে, নিজের ভাষায় কোনও বিষয় ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনই অনুভব না করে, তাহলে

পরীক্ষায় হয়তো সুন্দর উত্তর পাওয়া যাবে; কিন্তু জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়াটি কোথায়? গবেষণার ক্ষেত্রেও একই সমস্যা। গবেষক যদি তথ্যের উৎস যাচাই, যুক্তি নির্মাণ, তুলনা এবং বিশ্লেষণের বদলে তৈরি হয়ে থাকা এআই-উত্তরের উপর নির্ভর করেন, তাহলে গবেষণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ—প্রশ্ন করার ক্ষমতাটিই দুর্বল হয়ে যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রেও বিষয়টি একই। আগে একটি রিপোর্ট তৈরি করতে যে কর্মীকে তথ্য সংগ্রহ, যাচাই, বিশ্লেষণ এবং ভাষা নির্মাণ করতে হত, এখন তিনি কয়েকটি নির্দেশ দিয়েই সেই কাজের বড় অংশ করিয়ে নিতে পারেন। উপপাদনশীলতা অবশ্যই বাড়তে পারে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে যদি কর্মীর নিজের দক্ষতা আর বিকশিত না হয়, তাহলে একটি অদ্ভুত পরিস্থিতি তৈরি হবে—যন্ত্রের ক্ষমতা বাড়বে, অথচ যন্ত্রটি পরিচালনা করা মানুষের মৌলিক দক্ষতা কমবে। এখানেই এআই ব্যবহারের আসল প্রশ্নটি উঠে আসে। আমরা কি এআইকে ব্যবহার করছি, নাকি ধীরে ধীরে এআই আমাদের ব্যবহার করছে? প্রয়োজন এআই ব্যবহারের একটি সঠিক সংস্কৃতি তৈরি করা। যে কাজটি মানুষকে শেখাবে, সেখানে এআই যেন মানুষের জায়গা না নেয়। যে কাজটি মানুষের সময় বাঁচাবে, সেখানে এআই অবশ্যই ব্যবহার করা হোক। কিন্তু কোনও সমস্যার উত্তর পাওয়ার আগে সমস্যাটি বোঝার চেষ্টা, কোনও তথ্য গ্রহণের আগে তার সত্যতা যাচাই, কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজের যুক্তি তৈরি—এই জায়গাগুলি মানুষের হাতেই থাকা দরকার।

ষোলহাজার ফুটে সফল

প্রথম পাতার বাকি অংশ

বেশি সময় অবস্থান করার পর নিয়ন্ত্রিতভাবে সেটিকে নীচে নামিয়ে আনা হয়। প্ল্যাটফর্মটি সফলভাবে উদ্ধার করা হয়েছে এবং উড্ডয়ন চলাকালীন সংগৃহীত কর্মক্ষমতার তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উড্ডয়নের পুরো সময় গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশনে রিয়েল-টাইম ভিডিও এবং প্ল্যাটফর্মের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পরামিত্রির তথ্য পাওয়া যায়। প্ল্যাটফর্মে ইনশিয়ারল মেজারমেন্ট ইউনিট, গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম রিসিভার, অনবোর্ড ক্যামেরা, উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা-সহ বিভিন্ন ইন্সট্রুমেন্টেশন ও কন্ট্রোল ইলেকট্রনিক প্যাকেজ এবং অন্যান্য সাব-সিস্টেম ছিল। পরীক্ষায় সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী নির্ধারিত উড্ডয়ন কর্মক্ষমতা অর্জিত হয়েছে। হাই-অল্টিটিউড প্ল্যাটফর্মটি একটি হালকা-থেকে-বায়ু ব্যবস্থা, যা দীর্ঘক্ষণ স্ট্র্যাটোস্ফেরিক বায়বীয় নজরদারি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হচ্ছে।

কমিশনের স্পষ্টীকরণ

নয়াদিপ্লি: রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকের প্রক্রিয়া নিয়ে স্পষ্টীকরণ দিল নির্বাচন কমিশন। কমিশনের দাবি, মঙ্গলবার বিকেল ৪টা পর্যন্ত কোনও রাজনৈতিক দল তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট চায়নি। বিকেল ৪টার পর দিল্লি পুলিশের কাছ থেকে কমিশন জানতে পারে, বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে সাংসদদের একটি প্রতিনিধিদল কমিশনের সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি জমা দিতে চায়। কমিশন জানিয়েছে, ২০২৫ সালেই রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠকের জন্য একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি চালু করা হয়েছিল এবং সমস্ত রাজনৈতিক দলকে সেই প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানানো হয়। কোনও রাজনৈতিক দল বা একাধিক দলের যৌথ প্রতিনিধিদল কমিশনের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তাদের অনুমোদিত প্রতিনিধির মাধ্যমে আগাম সাক্ষাতের

আবেদন করতে হয়। এরপর দুই পক্ষের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে বৈঠকের সময় নির্ধারিত হয়। নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার বিকেল ৪টার পর সাংসদদের ওই প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকের প্রস্তাবটি কমিশনের বিবেচনাধীন থাকা অবস্থায় দিল্লি পুলিশের ডেপুটি কমিশনারের কাছ থেকে জানানো হয় যে প্রায় ২৪০ জন সাংসদ নিয়ে প্রতিনিধিদলটি বৈঠক করতে চায় এবং বৈঠকের প্রস্তাবিত স্থান ছিল সংসদ ভবন অ্যানেক্স। কমিশন এই ব্যবস্থাকে অস্বাভাবিক বলে মনে করে। কমিশন জানিয়েছে, তাদের নির্ধারিত প্রোটোকল অনুযায়ী রাজনৈতিক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক সাধারণত নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব প্রাক্ষণেই অনুষ্ঠিত হয়। সেই কারণে সংসদ ভবন অ্যানেক্সে ২৪০ জন সাংসদকে নিয়ে বৈঠকের প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।



শিবাজী লাহিড়ী কর্তৃক সম্পাদিত ও কাশ্মীরা লাহিড়ী কর্তৃক মঙ্গলবাড়ী, ওল্ড মালদা রোড, মালদা– ৭৩২১৪২ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত দৈনিক ই-পেপার। এই পত্রিকার কোনও মুদ্রিত সংস্করণ নেই। e-ISSN এর জন্য আবেদন করা হয়েছে।

যোগাযোগের জন্য ফোন নম্বার– ৯৪৩৪৮৭৮১০৮, ইমেইল sandarshan.magazine@gmail.com

বিজ্ঞান প্রযুক্তি সহযোগ

নয়াদিপ্লি: বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, গবেষণা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ভারত-সুইজারল্যান্ড দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত সহযোগিতাকে আরও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার উদ্যোগ নিল। নয়াদিপ্লিতে সুইস কনফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট গাই পারমেলিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং উদীয়মান প্রযুক্তি এবং গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণের বিষয়ে আলোচনা করেন। বৈঠকে ভারত-সুইস গবেষণা কাঠামো এবং যৌথ বৈজ্ঞানিক পর্যদকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি সুইজারল্যান্ডের পক্ষ থেকে অংশীদারিত্বে আরও ৪৫ মিলিয়ন সুইস ফ্রাঁ বরাদ্দের কথা জানানো হয়েছে। বৈঠকে জিতেন্দ্র সিং বলেন, ভারত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ক্রমশ আন্তঃবিষয়ক এবং মিশন-ভিত্তিক পদ্ধতির দিকে এগোচ্ছে। বিভিন্ন জাতীয় কর্মসূচিতে একাধিক শাখা ও মন্ত্রকের বিশেষজ্ঞদের একসঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকেও পৃথক কোনও ক্ষেত্র হিসেবে সীমাবদ্ধ না রেখে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে দেখা হচ্ছে। ভারতের বর্তমান গবেষণা অগ্রাধিকারের কথা তুলে ধরে তিনি জীবপ্রযুক্তি, টিকা উন্নয়ন, জিনোম সিকোয়েন্সিং, কোয়ান্টাম প্রযুক্তি, মহাকাশ এবং গভীর সমুদ্র গবেষণার কথা উল্লেখ করেন। একই সঙ্গে নীল অর্থনীতি এবং জৈব অর্থনীতির ক্ষেত্রেও দুই দেশের সহযোগিতার নতুন সম্ভাবনার কথা

বড় সিদ্ধান্ত

প্রথম পাতার বাকি অংশ

তার বেশি ব্যয়ের কেন্দ্রীয় সরকারি পরিবহণ ও পরিকাঠামো প্রকল্পের প্রযুক্তিগত মূল্যায়নও করবে আইটিএলএ। আর্থিক মূল্যায়ন অবশ্য বর্তমান ব্যবস্থার মাধ্যমেই চলবে। একই সঙ্গে এই ধরনের প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ, বিভিন্ন সমস্যার সমন্বিত সমাধান এবং প্রকল্প শেষ হওয়ার পর তার প্রভাব মূল্যায়নের দায়িত্বও থাকবে নতুন সংস্থাটির। পরিবহণ ব্যবস্থার জন্য একটি ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট ডেটা রিপোজিটরি তৈরিও আইটিএলএ-র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। জিএসটিএনের ই-ওয়ে বিল, ফাস্ট্যাগ, বাহন, জিপিএস-ভিত্তিক ব্যবস্থা, নগর ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং অন্যান্য তথ্যভান্ডার থেকে তথ্য সংগ্রহ করে একটি সমন্বিত ডেটা রিপোজিটরি তৈরি করা হবে। পণ্য পরিবহণের গতিপথ, উৎস ও গন্তব্যভিত্তিক বিশ্লেষণ-সহ বিভিন্ন তথ্য ব্যবহার করে ভবিষ্যৎ পরিকাঠামো পরিকল্পনা ও প্রকল্পের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা হবে। জাতীয় লজিস্টিক্স নীতি, ২০২২-এর পর্যালোচনা ও সংশোধনে পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি লজিস্টিক্স ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন, গবেষণা ও উদ্ভাবন এবং আন্তর্জাতিক সেবা পদ্ধতি গ্রহণেও আইটিএলএ ভূমিকা নেবে। এসএমএই গ্রোথ ফান্ড যেখানে ভারতের উৎপাদন ও উদ্যোগ ব্যবস্থাকে দীর্ঘমেয়াদি মূলধন দেওয়ার মাধ্যমে বড় আকারের প্রতিযোগিতামূলক সংস্থা তৈরির দিকে নজর দিচ্ছে, আইটিএলএ-র লক্ষ্য সেখানে সেই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবহণ ও লজিস্টিক্স ব্যবস্থাকে আরও সমন্বিত ও দক্ষ করে তোলা। দু’টি সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে শিল্পের বৃদ্ধির জন্য মূলধন এবং পরিকাঠামো—দুই দিকেই দীর্ঘমেয়াদি সক্ষমতা তৈরির একটি সমন্বিত কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্য স্পষ্ট হয়েছে।

সোনা উদ্ধার

কোচবিহার: সংগঠিত সোনা পাচারের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করে কোচবিহার জেলায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় প্রায় ৮.৩ কেজি বিদেশি সোনা উদ্ধার করল ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স বা ডিআরআই। উদ্ধার হওয়া সোনার আনুমানিক বাজারমূল্য ১২.৩৭ কোটি টাকা। পাচারের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ডিআরআই সুত্রে জানা গিয়েছে, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর নজরদারি চালাছিলেন সংস্থার আধিকারিকরা। সেই সুত্রেই ৫ অক্টোবর কোচবিহার জেলার চৌধুরীহাট থেকে কোচবিহারের দিকে যাওয়া পথে দুটি মোটরসাইকেলে থাকা চারজনকে আটক করা হয়। উদ্ধার হয় বিদেশি সোনার বিস্কুট।

উঠে আসে। দুই দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অংশীদারিত্বকে আরও দীর্ঘমেয়াদি ও কাঠামোবদ্ধ করতে ভারত-সুইস গবেষণা কাঠামো বা আইএসআরএফ এবং ভারত-সুইস যৌথ বৈজ্ঞানিক পর্যদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে। পাশাপাশি সুইস ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন এবং ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতরের মধ্যে স্বাক্ষরিত অভিপ্রায়পত্র এবং জুরিখ ইউনিভার্সিটি অব অ্যাপ্লায়েড সায়েন্সেস ও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতরের মধ্যে বাস্তবায়ন চুক্তিও গবেষণা সহযোগিতার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি আরও শক্তিশালী করবে। সুইস প্রেসিডেন্ট গাই পারমেলিন বলেন, ভারত দ্রুত বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ও উন্নয়ন শক্তি হিসেবে উঠে আসছে। শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সুইজারল্যান্ড ভারতকে দীর্ঘমেয়াদি পছন্দের অংশীদার হিসেবে দেখতে চায়। ২০০৩ সালে স্বাক্ষরিত ভারত-সুইজারল্যান্ড বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চুক্তির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, গত দুই দশকে দুই দেশের অংশীদারিত্ব ধারাবাহিকভাবে বিস্তৃত হয়েছে। এবার সেটিকে আরও কাঠামোবদ্ধ ও দীর্ঘমেয়াদি পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য রয়েছে। এই অংশীদারিত্বের জন্য সুইজারল্যান্ড আরও ৪৫ মিলিয়ন সুইস ফ্রাঁ বরাদ্দ করেছে। একই সঙ্গে ভারতও গবেষণা কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করার জন্য অনুরূপ প্রতিশ্রুতি দেবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন পারমেলিন। তাঁর মতে, দীর্ঘদিনের বৈজ্ঞানিক

নোবেল বরফের গভীরে

প্রথম পাতার বাকি অংশ

নোবেল পুরস্কার সেই পরিবর্তিত দৃষ্টিরই এক অসাধারণ স্বীকৃতি। এই ‘ভূতুড়ে কণা’-কেই মহাবিশ্বের নতুন দৃশ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক যাত্রার স্বীকৃতি মিলল ২০২৬ সালের পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কারে। বেলজিয়ামে জন্ম নেওয়া মার্কিন পদার্থবিদ ফ্রান্সিস হ্যালজেন পেলেন এই বছরের একক নোবেল। রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস তাঁকে সম্মানিত করেছে আইসকিউব নিউট্রিনো অবজারভেটরি-তে তাঁর নির্ণায়ক অবদান এবং জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক উৎস থেকে আসা উচ্চ-শক্তির নিউট্রিনো আবিষ্কারের জন্য। হ্যালজেনের গল্প আসলে একটি যন্ত্র তৈরির গল্পের চেয়েও বড়। এটি এমন এক বিজ্ঞানীর গল্প, যিনি প্রথমে ছিলেন তাত্ত্বিক কণাপদার্থবিদ, পরে ধীরে ধীরে এমন একটি পরীক্ষামূলক পরিকাঠামোর স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন, যার মাধ্যমে মহাবিশ্বকে আলো দিয়ে নয়, কণা দিয়ে দেখা যাবে। ১৯৪৪ সালে বেলজিয়ামে জন্ম হ্যালজেনের। লুভেন বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত ও পদার্থবিদ্যায় পড়াশোনা করে ১৯৬৬ সালে স্নাতকোত্তর এবং ১৯৬৯ সালে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। তাঁর পিএইচডি গবেষণার বিষয় ছিল হ্যাড্রনের ভাঙা প্রতিসার্য। এরপর ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনি জেনেভার সিইআরএন-এ বৈজ্ঞানিক সহযোগী হিসেবে কাজ করেন। ১৯৭১ সালে উইসকনসিন-ম্যাডিসন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা-সফরে গিয়ে যে সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত সেটিই তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনের ভিত্তি হয়ে ওঠে। ১৯৭২ সাল থেকে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার সঙ্গে যুক্ত। তখনও নিউট্রিনো তাঁর গবেষণার প্রধান বিষয় ছিল না। হ্যালজেনের প্রথম দিকের কাজ ছিল তাত্ত্বিক কণাপদার্থবিদ্যায়। কিউসিডি বা কোয়ান্টাম ক্রোমোডায়নামিক্সের মতো জটিল ক্ষেত্রেও তিনি কাজ করেছেন। কিন্তু ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি তাঁর আগ্রহ ঘুরতে শুরু করল নিউট্রিনোর দিকে। প্রশ্নটি ছিল সহজ—যদি নিউট্রিনো এত কম মিথস্ক্রিয়া করে, তাহলে তাকে শনাক্ত করার মতো যথেষ্ট বড় একটি ‘টেলিস্কোপ’ কি তৈরি করা যায়? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে হ্যালজেনের নজর পড়ে পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুর বরফের দিকে। ভাবনাটি ছিল আপাতদৃষ্টিতে অদ্ভুত। আকাশের দিকে কোনও আয়না বা প্রচলিত দূরবীক্ষণযন্ত্র তাক করানোর বদলে হাজার হাজার মিটার বরফের নিচে সেন্সর বসানো হবে। কোনও নিউট্রিনো যদি অত্যন্ত বিরলভাবে বরফের কোনও পরমাণুর সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে, তখন তৈরি হবে চার্জযুক্ত কণা। সেই কণা বরফের মধ্যে দিয়ে চলার সময় তৈরি করবে ক্ষীণ আলোর ঝলক। সেই আলো ধরতে পারলেই শনাক্ত করা যাবে নিউট্রিনোর উপস্থিতি এবং তার গতিপথ। এই ধারণা থেকেই ১৯৮৭ সালে শুরু হয় এএমএএনডিএ পরীক্ষা। সেটি ছিল আইসকিউবের পূর্বসূরি—দক্ষিণ মেরুর

সহযোগিতার ভিত্তিকে কাজে লাগিয়ে দুই দেশ আরও বড় পরিসরে যৌথ গবেষণা ও উদ্ভাবনের সুযোগ তৈরি করতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাও বৈঠকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। এআই-এর সুফল যাতে গ্লোবাল সাউথের দেশগুলিও পায়, তার উপর গুরুত্ব দেন সুইস প্রেসিডেন্ট। একই সঙ্গে আসন্ন জেনেভা এআই সমিটে ভারতকে অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ২০০৩ সালে আন্তঃসরকারি চুক্তির মাধ্যমে ভারত ও সুইজারল্যান্ডের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহযোগিতার আনুষ্ঠানিক ভিত্তি তৈরি হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ইন্দো-সুইস জয়েন্ট রিসার্চ প্রোগ্রামের মাধ্যমে এই সহযোগিতা আরও বিস্তৃত হয়। কোয়ান্টাম প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তি, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, সমুদ্র গবেষণা ও নীল অর্থনীতি, উন্নত উপাদান, ওষুধ, জৈব-চিকিৎসা গবেষণা, মহামারি মোকাবিলার প্রস্তুতি এবং মহাকাশ প্রযুক্তির মতো ক্ষেত্র এখন এই অংশীদারিত্বের আওতায় রয়েছে। নতুন ভারত-সুইস গবেষণা কাঠামোর লক্ষ্য হল নির্দিষ্ট প্রকল্পভিত্তিক সহযোগিতার গণ্ডি পেরিয়ে একটি কৌশলগত ও সমন্বিত গবেষণা অংশীদারিত্ব তৈরি করা। এর মাধ্যমে গবেষক ও জ্ঞান বিনিময়, প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ এবং দীর্ঘমেয়াদি যৌথ গবেষণার সুযোগ আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। বৈঠকে সুইজারল্যান্ডের শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবন দফতর, সুইস ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন, ইটিএইচ জুরিখ-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।